সংশয়: ইমাম ছাড়া জিহাদ

লেখকঃ শাইখ ড. হাকিম আল মুতাইরি

প্রশ্ন – অনেকে বলে থাকে যে, "ইমাম ও ঝান্ডা (রায়াহ) ছাড়া কোন জিহাদ নেই, এদুটো ব্যাতীত যা কিছু হচ্ছে তা হল ফিতনার লড়াই এবং সেগুলোতে যারা মারা যাবে তারা শহীদ হবে না। এবং শত্রুরা যদি কোন মুসলিম ভূমিতে আক্রমণ করে বসে তাহলে তাদেরকে প্রতিহত করার ক্ষমতা না রাখলে তখন তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা মুসলমানদের জন্য হারাম।"

তাহলে শরীয়তের মূলনীতি ও ফুকাহায়ে কেরামের মত অনুযায়ী এ মতটির বিশুদ্ধতার ব্যাপারে আপনাদের সম্মানিত রায় কী?

জবাব:

الحمد لله رب العالمين.

وصلى الله وسلم على نبيه الأمين وآله وصحبه أجمعين

সালফে সালেহীন ও সমস্ত উম্মাহর ইজম' অনুযায়ী এ মতের কোন ভিত্তি নেই। এটি একটি স্পষ্ট ভ্রান্ত মত, যা সুস্পষ্ট আয়াত ও হাদিস এবং শরয়ী নীতি ও ফিকহী মূলনীতির সাথে সাংঘর্ষিক। যেমন:

১) যে সমস্ত কোরআনের আয়াত ও হাদিসে আল্লাহর পথে জিহাদের নির্দেশ করা হয়েছে সেগুলোতে এ ধরণের কোন শর্তারোপ করা হয়নি; বরং এ আয়াত ও হাদিসগুলো ব্যাপক ও শর্তমুক্ত, এবং সেখানে একযোগে সমস্ত মুমিন-মুসলমানদেরকে জিহাদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যেমন, আল্লাহর এ আয়াতে,

وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم

অর্থাৎ – এবং যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে তোমরাও তাদের সাথে আল্লাহর পথে যুদ্ধ কর। (সুরা বাকারা: ১৯০)

এবং এ আয়াতে, **إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون**

অর্থাৎ – নিঃসন্দেহে আল্লাহ মুমিনদের নিকট থেকে তাদের প্রাণ ও তাদের ধন-সম্পদ সমূহকে এর বিনিময়ে ক্রয় করে নিয়েছেন যে, তাদের জন্যে জান্নাত রয়েছে, তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে, অতএব তারা হয় হত্যা করে অথবা তাদেরকে হত্যা করা হয়। (সুরা তাওবা: ১১১)

তেমনিভাবে রাসুল সাল্লাআল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর এই হাদিসে جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم

অর্থাৎ – তোমরা মুশরিকদের সাথে জিহাদ কর তোমাদের প্রাণ ধন-সম্পদ ও যবান দ্বারা।

ইবনে হাযম রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

আল্লাহ তাআলার এ আয়াতে **وقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك** (সুরা নিসা: ৮৪)

সমস্ত মুসলমানকে সম্বোধন করে করা হয়েছে। সুতরাং প্রত্যেকেই জিহাদের ব্যাপারে আদিষ্ট, যদিওবা তার সাথে আর কেউ না থাকে। (আল মুহাল্লা: ৭/৩৫১)

ইবনে কুদামা রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

জিহাদ আমলটি ফরজে কেফায়া। প্রথমে ফরজে আইনের মত এটিতেও সকলের প্রতিই সম্বোধন করা হয়। কিন্তু পরবর্তীতে ভিন্নতা চলে আসে। কেননা ফরজে কেফায়াটি কতক মানুষের সম্পাদন করার দ্বারা আদায় হয়ে যায়। আর ফরজে আইনটি একজন সম্পাদন করার দ্বারা আরেকজন থেকে মাফ হয়না। (আল মুগনী: ১০/৩৬৪)

আল্লামা আব্দুর রহমান বিন হাসান বিন মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, জিহাদের ফরজিয়্যাত (আবশ্যিকতা) কেয়ামত পর্যন্ত বাকি থাকবে এবং সকল মুমিনকেই সে ব্যাপারে সম্বোধন করা হয়েছে। সুতরাং যদি কোথাও এমন কোন সংঘবদ্ধ দল থাকে, যাদের প্রতিরক্ষা শক্তি রয়েছে তাহলে তাদের জন্য তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী আল্লাহর পথে জিহাদ করা ওয়াজিব। এ ফরজিয়্যাত না তাদের থেকে কখনো মাফ হবে, না অন্যান্য দলসমূহ থেকে। (আদ্ দুরারুস্ সুন্নিয়্যাহ: ৭/৯৮)

২) সমগ্র উম্মাহর এ কথার ওপর ইজমা' হওয়া যে, জিহাদ ফরজে কেফায়া আমল এবং সকলেই একসাথে এ আমলের প্রতি সম্বোধিত হয়ে থাকে। যাদের সামর্থ্য ও যোগ্যতা আছে এমন কেউ তা সম্পাদন করার আগ পর্যন্ত। সেক্ষেত্রে বাকিদের থেকে তা মাফ হয়ে যায়, ব্যতিক্রম হল ঐ অবস্থা যখন জিহাদ ফরজে আইন হয়ে যায়।

যেমন শাইখুল মুফাসসীর ইবনে জারীর আত-তবারী রাহিমাহুল্লাহ তার তাফসীর গ্রন্থে জিহাদ সম্পর্কে বলেন,

"তা সকলের ওপর ফরজ থাকে। জিহাদ সম্পাদন করার সামর্থ্য রাখে এমন কেউ তা সম্পাদন করার আগ পর্যন্ত। সেক্ষেত্রে বাকি মুসলমানদের থেকে ইহার ফরজিয়্যাত মুলতবি হয়ে যায়... এবং সকল ওলামায়ে মুসলিমীনই এ কথায় একমত।" (তাফসীরে তবারী: ৪/২৬৯)

ইবনে আতিয়্যা রাহিমাহুল্লাহ তার তাফসীর গ্রন্থে বলেন,

“যে কথার ওপর ইজমা’ হয়েছে তা হল, জিহাদ সমস্ত উম্মতে মুহাম্মদী সাল্লাআল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর ওপর ফরজে কেফায়া। যখন মুসলমানদের মধ্য থেকে কেউ তা সম্পাদন করে নিবে তখন বাকীদের থেকে তা স্হগিত হয়ে যাবে। তবে শত্রুরা মুসলমানদের ভূমিতে চলে এলে তখন তা ফরজে আইন হয়ে যায়।” (তাফসীরে কুরতবী: ৩/৩৮)

৩) জিহাদ দুই প্রকার:

প্রথম প্রকার হল, আক্রমণাত্মক জিহাদ। আর তা হল, শত্রুভূমিতে গিয়ে শত্রু তালাশ করা। এ প্রকারের জিহাদ শুদ্ধ হওয়ার জন্য খলিফা বিদ্যমান থাকা শর্ত নয়। বরং যখন আমীর জিহাদ সম্পাদন করতে থাকবে তখন তার অনুমতি ও সিদ্ধান্ত ব্যতীত অগ্রবর্তীতা ও স্বেচ্ছাচারিতা করা যাবে না, কেননা এ বিষয়টির দায়িত্ব দেয়া হয়েছে তাকে। তাই তার থেকে অনুমতি গ্রহণ করা ওয়াজিব। তবে তা জিহাদ শুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্ত নয়। এজন্য যে তার অনুমতি ছাড়া যে জিহাদ করবে সে গুনাহগার হবে ঠিকই কিন্তু তার জিহাদ শুদ্ধ হয়ে যাবে। আর যদি খলিফা না থাকে বা অনুপস্থিত থাকে বা নিহত হয়ে যায় তাহলে জিহাদ বন্ধ করে রাখবে না।

ইবনে কুদামা রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

“যদি খলিফা না পাওয়া যায় তাহলে জিহাদকে বিলম্বিত করবে না, কেননা বিলম্ব করার দ্বারা জিহাদের ফায়দা নষ্ট হয়ে যাবে। সেক্ষেত্রে যদি কোন গনীমত অর্জিত হয় তাহলে তা শরীয়তের আহকাম মোতাবেক গনীমতের হকদারদের মাঝে বন্টন করে দিবে।” (আল মুগনী:১০/৩৭৫)

সুতরাং যদি খলিফা বিদ্যমান থাকা জিহাদ শুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্তই হত তাহলে তা বন্ধ করে রাখা এবং খলিফা পাওয়া যাওয়া পর্যন্ত বিলম্বিত করা ওয়াজিব হত। এবং মুসলমানদের কল্যাণের স্বার্থে তা চালিয়ে নেয়ার অবকাশ থাকত না এবং গনীমত ভক্ষণও তখন বৈধ হত না।

তেমনিভাবে যখন খলিফা বিদ্যমান থাকবে ঠিকই কিন্তু মুজাহিদীনদের জন্যে তার কাছ থেকে অনুমতি গ্রহণ করা অসম্ভব প্রায় হয়ে যাবে (তখনও জিহাদ বিলম্বিত করা ওয়াজিব হত)। অথচ প্রয়োজনের তাগিদে খলিফার অনুমতি ছাড়াই তাদের জন্য তা চালিয়ে যাওয়া বৈধ।

ইবনে কুদামা রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

"তারা খলিফার অনুমতি ছাড়া বের হবে না। কেননা যুদ্ধের বিষয়টি তার দায়িত্বে দেয়া হয়েছে। তবে যদি শত্রুর আকস্মিক হামলার কারণে তার কাছ থেকে অনুমতি গ্রহণ করা অসম্ভবপ্রায় হয়ে যায়, তাহলে তখন অনুমতি গ্রহণ ওয়াজিব থাকবে না। ক্ষতিটি শত্রুর সাথে লড়াই না করা ও জিহাদে বের না হওয়ার মাঝে নির্দিষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণে ও বেরিয়ে পড়ার মধ্যে কল্যাণ নির্ধারিত হয়ে যাওয়ার কারণে।" (আল মুগনী: ১০/৩৯০)

সুতরাং যদি খলিফার বিদ্যমান থাকা ও তার অনুমতি গ্রহণ আক্রমণাত্মক জিহাদ শুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্তই হত তাহলে তার বিদ্যমান না থাকার সময়ও জিহাদ শুদ্ধ হত না এবং বিদ্যমান থাকার সময়ও প্রয়োজনের সময় অনুমতি ছাড়া জিহাদ শুদ্ধ হত না। কেননা শর্ত তাকে বলা হয়, যার শূন্যতায় যার জন্য তাকে শর্ত করা হয়েছে তার শূন্যতাও আবশ্যক। অথচ এখানে এই দুই প্রকারের আক্রমণাত্মক জিহাদকে ফুকাহায়ে কেরাম নাকচ করেননি। এদ্বারা বুঝা গেল খলিফা বিদ্যমান থাকা এ প্রকারের জিহাদ শুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্ত নয়। বরং উভয় অবস্থাতেই বিবেচ্য বিষয় হল, মুসলমানদের কল্যাণ নিশ্চিত করা ও ক্ষতি বিদূরিত করা। যেমনটি ইবনে কুদামা রাহিমাহুল্লাহ কারণ দর্শিয়েছেন।

আর দ্বিতীয় প্রকার হল, শত্রুদের থেকে মুসলিমভূমির প্রতিরক্ষামূলক জিহাদ। এ প্রকারে খলিফা বা ঝান্ডা থাকাটা শর্ত নাকি শর্ত না, তা আরো অধিকতর স্পষ্ট ও পরিষ্কার। কেননা এ প্রকার জিহাদ ওয়াজিব হওয়ার জন্য কোনই শর্ত নেই; বরং প্রত্যেকের ওপরই ওয়াজিব তার সাধ্যমত প্রতিরোধ করা। সুতরাং সন্তান তার বাবার কাছে, স্ত্রী তার স্বামীর কাছে, ঋণগ্রহীতা তার ঋণদাতার কাছে অনুমতি

চাইবে না। অথচ এরা সকলেই অনুমতি ও আনুগত্যে আমীরের তুলনায় বেশি হকদার ছিল। তা সত্বেও এমতাবস্থায় তাদের হক বাতিল হয়ে গেছে। কেননা জিহাদ এখন সকলের ওপরই ফরজে আইন।

তাই এখন খলিফার বিদ্যমানতা শর্ত হওয়া তো দূরের কথা, বরং খলিফা বিদ্যমান থাকা সত্বেও তার থেকে অনুমতি গ্রহণ করা শর্ত না।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

“আর ইজ্জত-আবরু ও দ্বীন প্রতিরক্ষায় লড়াই করা সকলের ঐক্যমতে ওয়াজিব। কেননা যেই আক্রমণকারী শত্রু মুসলমানদের দ্বীন ও দুনিয়া উভয়টি ক্ষতিগ্রস্ত করে ঈমান আনার পর তাকে প্রতিহত করার চেয়ে বড় কোন ওয়াজিব নেই। তাই তা ওয়াজিব হওয়ার জন্য কোন শর্ত নেই; বরং সাধ্যমতো তাদের প্রতিহত করা হবে।” (আল ফাতাওয়াল মিসরিয়্যাহ: ৪/৫০৮)

তিনি আরো বলেন,

“শত্রুরা যখন মুসলিম শহরে অনুপ্রবেশ করে, তখন এতে কোন সন্দেহ থাকে না যে, তাদেরকে প্রতিহত করা প্রথমে বেশি নিকটবর্তী লোকদের ওপর, তারপর যে বেশি নিকটবর্তী তাদের ওপর... এইভাবে সকল মুসলিমদের ওপর ওয়াজিব হয়ে যায়। কেননা ইসলামী সমস্ত শহর একটি শহরের মত। আর তখন সেদিকে যুদ্ধযাত্রা করা পিতা ও ঋণদাতার অনুমতি ব্যতিতই ওয়াজিব হয়ে যায়।

ইবনে হাযম রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

তবে যদি শত্রুরা মুসলমানদের কোন জনগোষ্ঠীর ওপর আক্রমণ করে বসে, তাহলে তাদেরকে সাহায্য করতে সক্ষম এমন প্রত্যেকের ওপর ফরজ হয়ে যায় তাদের সাহায্যার্থে তাদের উদ্দেশ্য যুদ্ধযাত্রা করা।” (আল মুহাল্লা: ৭/২৯২)

আবু বকর জাসসাস রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

“সমস্ত মুসলমানগণ দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতঃ জানে যে, যখন সীমান্তবাসীরা শত্রুর আশঙ্কা করে এবং তাদের কাছে প্রতিরোধ ক্ষমতাও না থাকার ফলে তারা নিজেদের জান, সন্তান এবং শহর নিয়ে শঙ্কাবোধ করে তখন সমগ্র মুসলিম উম্মাহর ওপর ফরজ হয়ে যায় শত্রু অভিমুখে যুদ্ধযাত্রা করে মুসলমানদের থেকে তাদের জুলুমকে প্রতিহত করা। এবং এ ব্যাপারে উম্মাহর কারো মাঝে কোন দ্বিমত নেই।” (আহকামুল কোরআন: ৪/৩১২)

খতিব আশ্ শিরবিনী আশ্ শাফিয়ী’ রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

“কাফেরদের দ্বিতীয় অবস্থা হল এই যে, তারা আমাদের কোন শহরে প্রবেশ করে ফেলবে। সেক্ষেত্রে শহরবাসীর ওপর আবশ্যক হয়ে যায় তাদেরকে যথাসাধ্য প্রতিহত করা এবং জিহাদ তখন হয়ে যায় ফরজে আইন।” (আল ইকনা’: ২/৫১০)

এটাই হচ্ছে জিহাদ ফরজে আইন হওয়ার মর্ম। (অর্থাৎ তাৎক্ষনিকভাবে বেরিয়ে পড়তে হবে)। সুতরাং যদি তা শুদ্ধ হওয়ার জন্য কোন শর্ত থাকতো যেমনঃ খলিফা বিদ্যমান থাকা বা তার অনুমতি গ্রহণ করা, তাহলে শত্রুরা মুসলমানদের ওপর আক্রমণ করার সময় কখনোই তা ফরজে আইন হত না। অথচ উম্মাহর কোন আলেমই একথার প্রবক্তা না। একারণেই মাওয়ারদী রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, ফরজে কেফায়া জিহাদ পরিচালনা করবেন খলিফা, যে যাবৎ না তা ফরজে আইন হয়ে যায়।

ফুকাহায়ে কেরামের কিতাবে জিহাদ অধ্যায়ে জিহাদ ওয়াজিব হওয়ার শর্ত, জিহাদ কার ওপর ওয়াজিব হবে এবং কখন ওয়াজিব হবে? ইত্যাদি সবকিছু লেখা রয়েছে কিন্তু সেখানে খলিফা বা ঝান্ডা বিদ্যমান থাকাকে শর্তারোপ করা হয়নি। অথচ সহীহ্ হাদিসে এসেছে,

ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل

অর্থাৎ: লোকদের কি হল যে তারা আল্লাহর কিতাব বহির্ভূত বিষয় সমূহকে শর্তারোপ করছে? যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাব বহির্ভূত কোন বিষয়কে শর্তারোপ করবে তা অকার্যকর।

আব্দুর রহমান বিন হাসান বিন মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব রাহিমাহুল্লাহ এই শর্তটির অসারতা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন যে,

"কোন্ কিতাব বা কোন্ দলিল দ্বারা এটা প্রমানিত হল যে, আমীর না থাকলে জিহাদ ওয়াজিব হয়না?! এটা দ্বীনের ব্যাপারে কুৎসা রটানো ও মুসলমানদের পথ পরিহারের নামান্তর। এ বক্তব্যটির অসারতা প্রমানিত করার জন্যে দলিলের অপেক্ষা রাখে না। তন্মধ্যে একটি হল, জিহাদের আদেশ ও উৎসাহ মূলক আয়াত-হাদিসগুলো এবং জিহাদ ত্যাগের নিষেধ ও হুশিয়ারি মূলক আয়াত-হাদিসগুলো উল্লেখিত শর্তমুক্ত থাকা।" (আদ্ দুরারুস্ সুন্নিয়্যাহ: ৭/৯৭)

হাসান সিদ্দীক রাহিমাহুল্লাহ জিহাদ সম্বন্ধে বলেন,

"ইহা দ্বীনের ফরায়েজ সমূহের মধ্য থেকে একটি ফরজ, আল্লাহ তাআলা তা তাঁর মুসলমান বান্দাদের ওপর ফরজ করেছেন কোন স্হান বা কাল বা ইনসাফ বা জুলুম বা ব্যক্তির সহিত সীমাবদ্ধ করা ব্যতীত।" (আর রওজাতুন্ নাদিয়্যাহ্: ৩৩৩)

সুতরাং জিহাদ কেয়ামত পর্যন্ত চলবে, চাই আমীর বিদ্যমান থাকুক বা না থাকুক এবং চাই সেখানে ঝান্ডা বিদ্যমান থাকুক বা না থাকুক।

আয্ যাদ: ৩/৩০৯ অনুযায়ী শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ এবং ইবনুল কাইয়্যিম রাহিমাহুল্লাহ এবং আব্দুর রাহমান বিন হাসান ও অন্যান্য ইমামগণ দলিল দিয়ে থাকেন হযরত আবু বসির রাদিয়াল্লাহু আনহু এর মুশরিকদের বিরুদ্ধে তার জিহাদ ও পথরুদ্ধ করার ঘটনা দ্বারা। যেখানে অবশেষে রাসুল সাল্লাআল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বীরত্বের প্রসংশা করে তার শানে এরশাদ করেছিলেন যে,

ويل أمه مسعر حرب لو كان معه رجال

অর্থাৎ: তার মায়ের জন্য আফসোস! (এটা আবেগ প্রকাশে আরবে প্রচলিত একটি কথা), এটা তো যুদ্ধের স্ফুলিংগ, তার জন্য যদি কেউ থাকতো।”

অথচ তখন হযরত আবু বসির রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অধীনেও ছিলেন না এবং কোন দারুল ইসলামেও ছিলেন না, এমনকি নিজেও স্বয়ং কোন খলিফা ছিলেন না এবং তার সাথে কোন ঝান্ডাও ছিল না; বরং তিনি মুশরিকদের ওপর আক্রমণ করে তাদের সাথে লড়াই করে গনীমত আহরণ করতেন ও তা দ্বারা স্বনির্ভরতা অর্জন করতেন। কিন্তু এতদ্বাসত্বেও রাসুল সাল্লাআল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামতাকে মৌন সমর্থন দিয়েছেন ও তার প্রশংসা করেছেন।

আব্দুর রহমান বিন হাসান রাহিমাহুল্লাহ এ ঘটনা দ্বারা দলিল পেশ করে বলেন,

“রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি তাদেরকে বলেছেন যে, কুরাইশদের সাথে লড়াই করে তোমরা ভুল করেছো, কেননা তোমরা তো কোন খলিফার অধিনে নও?! আশ্চর্য, মূর্খতা মূর্খদের জন্য কতটা ক্ষতিকারক হতে পারে!” (আদ্ দুরারুস্ সুন্নিয়্যাহ: ৭/৯৭)

৫) জিহাদ কায়েম করা যেমন ওয়াজিব, খলিফা নিযুক্ত করা তেমনই ওয়াজিব। তাই মুজাহিদীনদের জন্যে আবশ্যক হল, পূর্ব থেকে সেখানে কোন রাষ্ট্রিয় খলিফা না থাকলে নিজেদের মধ্য থেকে কাউকে আমীর বানিয়ে নেওয়া। কেননা খলিফা বিদ্যমান থাকা জিহাদ শুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্ত নয়, বরং খলিফার বিদ্যমানতার জন্য (অর্থাৎ খলিফার খলিফা হিসেবে বাকি থাকার জন্য) জিহাদ শর্ত। কেননা খলিফার রাষ্ট্র পরিচালনা শুদ্ধ হওয়ার জন্য জিহাদ কায়েম করা শর্ত।

সুতরাং (সঠিক হল যে) জিহাদ ছাড়া কোন খলিফা থাকতে পারে না, এটা নয় যে, খলিফা ছাড়া কোন জিহাদ থাকে না।

যেমন আব্দুর রহমান বিন হাসান রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন,

“যারা আল্লাহর পথে জিহাদ করল তারা আল্লাহর আনুগত্য করল ও আল্লাহ তাআলা তাদের প্রতি যা ফরজ করেছিলেন তা আদায় করল। আর কোন খলিফা খলিফা থাকতে পারে না জিহাদ ছাড়া। এটা নয় যে, খলিফা ছাড়া কোন জিহাদ থাকে না।” (আদ্ দুরারুস্ সুন্নিয়্যাহ: ৭/৯৭)

সকলেরই জানা যে, খলিফার সর্বপ্রথম দায়িত্ব হচ্ছে: জনগণকে রক্ষা করা এবং শরীয়ত প্রতিষ্ঠা করা। সুতরাং সে যদি জিহাদ ও জনগণকে রক্ষা করতে অক্ষম হয় তাহলে সে খেলাফতের গন্ডি থেকে বেরিয়ে যায়। বরং তখন তার বিদ্যমান থাকা না থাকা বরাবর হয়ে যায়। আর যদি সে মুসলমানদের জানমাল ও ইজ্জত-আব্রু রক্ষায় অন্তরায় হয়ে যায়, তাহলে তখন তার বিদ্যমান থাকার চেয়ে না থাকাই ভাল। এবং শরীয়তগতভাবে তখন তার খেলাফত বাতিল হয়ে যায়। কেননা তার খলিফা থাকার উদ্দেশ্য এখন আর পাওয়া যাচ্ছে না। হাদিস শরীফে এসেছে,

إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به

অর্থাৎঃ খলিফা হচ্ছে ঢাল স্বরুপ, যার অধীনে থেকে যুদ্ধ করা হয় এবং শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। তাই খলিফা এজন্য নিযুক্ত করা ওয়াজিব, যেন সে ঢাল ও প্রতিবন্ধক হয়ে জনগনকে রক্ষা করতে পারে এবং জনগণ তার অধীনে থেকে লড়াই করতে পারে। পক্ষান্তরে সে যদি (মুসলিমদের বদলে) শত্রুদের ঢাল হয় তাহলে তো সে জাগতিককভাবে মুসলমানদের খলিফা হিসেবে বাকি থাকলেও শরীয়তগতভাবে কিছুতেই খলিফা থাকতে পারে না।

আশ-শাওকানী রাহিমাহুল্লাহ ওয়াবলুল গমাম কিতাবে বলেন,

“খেলাফতের মূলভিত্তি ও প্রধান শর্ত হচ্ছে, জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ও জালিমের জুলুমে মাজলুমের প্রতি ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে এবং তারা যদি কোন ভীতিকর বস্তু যেমনঃ কাফের বা বিদ্রোহী সেনাদলের সম্মুখীন হন তাহলে

তা প্রতিহত করতে সমর্থ হওয়া। যে শাসক এই অবস্থানে থাকে মূলতঃ তার ব্যাপারেই বর্ণিত হয়েছে যে, তার আনুগত্য ওয়াজিব এবং তার বিরুদ্ধাচরণ হারাম। বরঞ্চ এ কাজগুলোর জন্যেই আল্লাহ তাআলা খলিফা নিযুক্ত করাকে বিধিবদ্ধ করেছেন এবং তাকে দ্বীনের গুরুত্বপূর্ণ বিধানগুলোর মাঝে স্হান দিয়েছেন।” (সিদ্দীক খাঁন রাহিমাহুল্লাহ এর ইকলীলুল কারামাহ: ১১৪,১১৫)

৬) মুসলমান ও তাদের শত্রুদের মাঝে সংঘটিত প্রতিটি যুদ্ধকেই জিহাদ বলা। চাই তা আক্রমণাত্মক হোক বা প্রতিরক্ষামূলক।

যেমন, আব্দুর রহমান বিন হাসান রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন,

“যে ব্যক্তি শত্রুর মুখোমুখী দাঁড়াবে এবং তার প্রতিরোধে পূর্ণ প্রচেষ্টার সাথে সংগ্রাম চালিয়ে যাবে নিঃসন্দেহে সে মুজাহিদ। আর যে দলই আল্লাহর শত্রুদের মুকাবিলা করবে, তাদের জন্যে এমন কিছু নেতৃস্থানীয় লোকদের প্রয়োজন যাদের মন্তব্য ও পরিকল্পনাকে তারা পাথেয় হিসেবে গ্রহণ করবে। আর লোকদের মধ্যে খলিফা হবার অধিকতর যোগ্য ঐ ব্যক্তি, যে পরিপূর্ণভাবে শরীয়ত প্রতিষ্ঠা করতে পারবে। তারপর যে বেশী শ্রেষ্ঠতর, তারপর যে বেশী শ্রেষ্ঠতর। অতপর যদি লোকেরা তাকে মান্য করে তাহলে তো তারা ওয়াজিব আদায় করে নিল, অন্যথায় তারা শক্ত গোনাহগার হবে ইসলামের এই মহান বিধানটি পরিত্যাগ করার কারণে। আর যারা এ গুরুদায়িত্ব সম্পাদন করবেন (অর্থাৎ তার সাহায্যকারী ও সহকারীবৃন্দ) তারা বিরাট সওয়াবের ভাগিদার হবেন। কুরআন সুন্নাহ ও ইজমা’ দ্বারা এমনটিই বুঝে আসে।” (আদ্ দুরারুস্ সুন্নিয়্যাহ: ৭/৯৮)

মোটকথা প্রকৃতপক্ষে জিহাদ হচ্ছে, আল্লাহর শত্রু ও আল্লাহর বন্ধুদের শত্রুকে প্রতিহত করার জন্য শক্তি ব্যয় করা। আর কিতাল তথা রক্তক্ষয়ী লড়াই হচ্ছে তার সর্বোৎকৃষ্ট প্রকার।

সুতরাং যে কেউই শত্রুর সাথে আক্রমণাত্মক বা প্রতিরক্ষামূলক লড়াই করবে সেই মুজাহিদ ও তার এ লড়াই জিহাদ বলে গন্য হবে। এবং এ লড়াইয়ে যে কেউই মারা

যাবে সেই শহীদ ও দুনিয়াতে তার সাথে শহীদেরই আচরণ করা হবে, চাই সে পুরুষ হোক বা মহিলা, বড় হোক বা ছোট, সুন্নি হোক বা বেদআতী, নেককার হোক বা বদকার।

যেমন হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রাহিমাহুল্লাহ "শহীদের জানাযার নামাজ" অধ্যায়ে বলেন,

"যাইন ইবনুল মুনীর রাহিমাহুল্লাহ বলেছেনে, শহীদ দ্বারা উদ্দেশ্য হল রণাঙ্গনের নিহত ব্যক্তি অর্থাৎ, কাফেরদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে মুসলমানদের (নিহত ব্যক্তি)"। হাফেজ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, এক্ষেত্রে নারী- পুরুষ, ছোট-বড়, স্বাধীন-দাস, নেককার ও বদকারের মাঝে কোন ভেদাভেদ নেই।" (ফাতহুল বারী:৩/৩০৯)

সুতরাং এ নিয়ে ওলামায়ে কেরামের মাঝে কোন দ্বিমত নেই যে, যে মুসলমানই কাফেরদের সাথে লড়াইয়ে মারা যাবে দুনিয়ার বিচারে সেই শহীদ। এজন্যেই তারা এ নিয়ে মতবিরোধ করেছেন যে, তার জানাযার নামাজ কি পড়া হবে নাকি না? এবং তাকে কি গোসল দেয়া হবে নাকি না? অধিকাংশ ফুকাহায়ে কেরাম এ মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন যে, তাকে গোসলও দিতে হবে না এবং তার জানাযার নামাজও পড়া হবে না। তবে তারা তার শহীদ হওয়া না হওয়া নিয়ে কোন দ্বিমত করেননি। কেননা তার গোসল ও নামাজ নিয়ে তাদের মতবিরোধের কারণ হল, তারা সবাই এতে একমত যে, সে এমন শহীদ শরীয়তে অন্যান্য মৃত মুসলমানদের তুলনায় যার একটা আলাদা বৈশিষ্ট্য রয়েছে। তবে এর অর্থ এটা নয় যে, তার জান্নাতে প্রবেশ করা ও আল্লাহর দরবারে তার শাহাদত কবুল হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত কিছু বলা হচ্ছে। কেননা তা আল্লাহ তাআলা ছাড়া কেউ জানেন না।

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রাহিমাহুল্লাহ 'অমুক শহীদ হয়েছে বলা যাবে না' এ অধ্যায়ে বলেন, "ওহীর সুত্র ছাড়া কারো ব্যাপারে নিশ্চিত করে বলা যাবে না যে, অমুকে শহীদ হয়েছে… যদিওবা তা সত্বেও বাহ্যিকভাবে তাদেরকে শহীদের হুকুম প্রদান করা হবে। এ কারণেই সালাফে সালেহীনগণ বদর উহুদ ও অন্যান্য যুদ্ধের মৃতদেরকে শহীদ আখ্যাদানে একমত পোষণ করেছেন। এবং এদ্বারা উদ্দেশ্য

হচ্ছে, প্রবল ধারণার ওপর ভিত্তি করে বাহ্যিক হুকুম লাগিয়ে দেয়া।” (ফাতহুল বারী: ৬/৯০)

আর ফেতনার লড়াই হচ্ছে ঐ লড়াই যা মুসলমানদের মাঝে অজ্ঞতাপূর্ণ মনোভাব বা দেশ দখল রাজত্ব দখল ইত্যাদির ভিত্তিতে সংঘটিত হয়ে থাকে। সুতরাং এটাই হচ্ছে সেই ফেতনার লড়াই, যাতে শরীক হওয়া হারাম। বরং তখন ওয়াজিব হল তাদের পরস্পরের মাঝে সুসম্পর্ক স্হাপনের চেষ্টা করা। এতে যদি একদল ফিরে আসে তাহলে যে দল ফিরে আসবে না তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা ওয়াজিব, যে পর্যন্ত না তারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে।

আর কাফের শত্রু যখন কোন মুসলিম ভূমিতে আক্রমণ করে বসে তখন তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করাটা কোন ফেতনার লড়াই হতে পারে না। এমন কথা উম্মতের বিগত ওলামায়ে কেরামের মধ্যে কেউই বলেনি। বরং ফেতনা তো হচ্ছে সে সময় লড়াই পরিত্যাগ করা এবং তাদেরকে প্রতিরোধ না করার মাঝে। বরঞ্চ সে সময়কার যুদ্ধ বন্ধ করাটা আল্লাহর সাথে শিরিক করার পর সবচেয়ে বড় গুনাহ।

ইবনে হাযম রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

“যে ব্যক্তি কাফেরদের সাথে জিহাদ করতে নিষেধ করে এবং পবিত্র স্হানগুলোকে তাদের নিকট সমর্পণ করার জন্যে আদেশ করে, কুফরীর পর এই ব্যক্তির গুনাহের চেয়ে বড় আর কোন গুনাহ নেই।” (আল মহল্লী: ৭/৩০০)

যেমনিভাবে শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ এর কথামতো ঈমান আনার পর মুসলিম ভূমি থেকে শত্রুদের প্রতিহত করার চেয়ে বড় আর কোন ওয়াজিব নেই।

৭) বিভিন্ন সনদে রাসুল সাল্লাআল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামথেকে বর্ণিত হয়েছে তিনি বলেছেন,

من قاتل دون ماله فهو شهيد، ومن قاتل دون دينه فهو شهيد، ومن قاتل دون أهله فهو شهيد

অর্থাৎঃ যে ব্যক্তি সম্পদ রক্ষায় লড়াই করে (মারা যাবে) সে শহীদ, যে ব্যক্তি দ্বীন রক্ষায় লড়াই করে (মারা যাবে) সে শহীদ, যে ব্যক্তি পরিবার রক্ষায় লড়াই করে (মারা যাবে) সে শহীদ।

আর এটা সর্বজনস্বীকৃত যে, এ হাদিসটি সকলের ক্ষেত্রেই ব্যাপক। বরং এ হাদিসটি একক ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হওয়ার ব্যাপারে কারো দ্বিমত নেই এবং প্রতিটি মুসলমানের জন্যে বৈধ আছে যে, সে নিজের ইজ্জত-সম্মান সম্পদ ও দ্বীনকে প্রতিরক্ষার জন্যে লড়াই করবে যদিও সে একা হয়, এমনকি আগ্রাসী ব্যক্তি যদি তার মতো একজন মুসলিমও হয় তবুও এবং এক্ষেত্রে যদি সে মারা যায় তাহলে সে শহীদ হবে। সুতরাং যে ব্যক্তি খলিফার বিদ্যমান থাকা বা তার অনুমতি গ্রহণকে শর্তারোপ করে থাকে সে এ হাদিসের নির্দেশনাকেই অকেজো করে দেয়। পরন্তু সহীহ্ মুসলিম দ্বারা প্রমাণিত যে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এ হাদিস দ্বারা মুসলিমের জন্য নিজ জান মাল ও ইজ্জত-সম্মানের প্রতিরক্ষায় লড়াই করা জায়েয হওয়ার ব্যাপারে দলিল প্রদান করেছেন। এমনকি আগ্রাসী ব্যক্তি যদি স্বয়ং খলিফাও হয় তবুও। বাদশাহ যখন তাঁর (আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এর) জমি নিয়ে যেতে মনস্থ করে তখন তিনি এই হাদিস দ্বারা দলিল পেশ করে বাদশাহর সাথে লড়াই করার জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করেন।

সুতরাং এ জাতীয় লড়াইয়ে যেহেতু খলিফার অনুমতি গ্রহণ এবং ঝান্ডা বিদ্যমান থাকা শর্ত নয়, তাহলে কাফের শত্রু থেকে নিজের জান, মাল, ইজ্জত-সম্মান, ভূমি ও দ্বীন প্রতিরক্ষায় কি করে তা শর্ত হতে পারে? বরং নিঃসন্দেহে সেক্ষেত্রে এ হুকুম আরো ভালভাবে প্রযোজ্য হবে। (অর্থাৎ তখন সন্দেহাতীতভাবে অনুমতি গ্রহণ এবং ঝান্ডা বিদ্যমান থাকা শর্ত থাকবে না)।

৮) সহীহ হাদিসের কিতাবে তায়েফায়ে মানসুরাহ্ সম্পর্কিত হাদিস তথা

لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم

অর্থাৎঃ আমার উম্মতের একটি দল সর্বদাই হক্কের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করে থাকবে, যারা তাদের পরিত্যাগ করবে ও বিরোধিতা করবে তারা তাদের কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। অপর বর্ণনায় এসেছে,

يقاتلون على الحق

অর্থাৎঃ হক্কের ওপর থেকে লড়াই করে যাবে।

এদ্বারা উদ্দেশ্য হল মুজাহিদীনে কেরাম।

"ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রাহিমাহুল্লাহ এর নিকট এই তায়েফায়ে মানসুরাহ্ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, এরা হচ্ছে ঐ সমস্ত লোক যারা রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। যারাই মুশরিকদের বিরুদ্ধে লড়াই করে তারাই হক্কের ওপর রয়েছে।" (মাসাইলে ইবনে হানী: ২/১৯২)

এটা সবাই জানে যে, একটি দল জাতির কতিপয় লোকই হবে পুরো জাতি হবে না। আর তাদের জিহাদ ও বিজয়ও সেক্ষেত্রে জাতি ও খলিফা ব্যতিতই হয়ে থাকবে। কেননা খলিফা যদি তাদের সাথে থাকতোই তাহলে তো খলিফার অনুগামী হয়ে পুরো জাতিই তাদের সাথে থাকত। আর সেক্ষেত্রে তো জাতির তুলনায় এই দলটির আলাদা কোন বৈশিষ্ট্য রইল না। সুতরাং উপরোক্ত হাদিসটি ইঙ্গিতাকারে এ কথারই জানান দিচ্ছে যে, মুসলমানদের একটি দল এককভাবে মুশরিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে পারবে, যদিওবা পুরো জাতিই তাদেরকে পরিত্যাগ করে এবং খলিফাও তাদেরকে সাহায্য না করে। আর যদি জিহাদ শুদ্ধ হওয়ার জন্য খলিফা বিদ্যমান থাকা বা তার অনুমতি গ্রহণ শর্তই হত তাহলে হাদিসে বর্ণিত সেই দলটির জন্য জিহাদ করাও শুদ্ধ হতনা এবং আল্লাহ তাআলাও সমগ্র জাতিকে ছেড়ে তাদেরকে এই মহান শ্রেষ্ঠত্বে ভূষিত করতেন না।

৯) কর্মভিত্তিক ইজমা’ উক্তিমূলক ইজমা’কে আরো বেশী জোরদার করেছে। কেননা এ যুগে যেখানেই শত্রুরা মুসলমানদের ওপর আক্রমণ করেছে খলিফার অবিদ্যমানতা সত্ত্বেও তখনই মুসলমানরা তাদের মোকাবেলা করে তাদের প্রতিরক্ষা করেছেন। যেমনটি ঘটেছে পশ্চিমা ঔপনিবেশিকদের অধীনে ইসলামী বিশ্বের পতনের পর ও খেলাফতে ওসমানীর ধ্বংসের পর। তখন আলজেরিয়া লিবিয়া মিসর সিরিয়া ইরাক ও ভারতবর্ষসহ অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর ওলামায়ে কেরাম ও মুজাহিদীনগণ তাদের ভূমি ও ইজ্জত-সম্মান রক্ষায় প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন। এমনকি তাদের বিরুদ্ধে যারা জিহাদ করে তাদের জিহাদ বৈধ হওয়ার ব্যাপারে ও তাদেরকে সাহায্য করা ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারেও ওলামায়ে কেরাম তখন একমত পোষণ করেছিলেন। অথচ তখন মুসলমানদের না ছিল কোন ব্যাপক খলিফা, না ছিল সে অঞ্চলগুলোর জন্যে কোন বিশেষ আমীর, আর না ছিল তাদের নিকট কোন ভারসাম্যপূর্ণ শক্তি; বরং তা ছিল আবু বাসির রাদিয়াল্লাহু আনহু ও তার সাথীদের ন্যায় কেবলই একটি গোষ্ঠীকেন্দ্রীক যুদ্ধ, যা তারা চালিয়ে গিয়েছেন স্বদেশ স্বাধীন হওয়া ও পশ্চিমা ঔপনিবেশিকদের বেরিয়ে যাওয়ার আগপর্যন্ত।

সুতরাং যারা জিহাদ শুদ্ধ হওয়ার জন্য খলিফা বা ঝান্ডা বিদ্যমান থাকাকে শর্তারোপ করে থাকে, তারা বিদেশী ঔপনিবেশিকদের বিরুদ্ধে যে সমস্ত ওলামায়ে কেরাম ও নেতৃস্থানীয় মুসলমানগণ জিহাদ করেছেন এবং নারী শিশু ও ভূমি রক্ষায় শত্রুদের সাথে লড়াই করে যত মিলিয়ন মিলিয়ন মুসলমান শহীদ হয়েছেন তাদের সকলের জিহাদকে নাকচ করে দিচ্ছে।

১০) জিহাদ একটি বোধগম্য ফরজ ইবাদত। যৌক্তিকতার বাইরে স্রেফ ইবাদতমূলক কোন বিধান না। সুতরাং তা বিধিবদ্ধ করার উদ্দেশ্য হল, জনগণকে রক্ষা করা, শত্রুদেরকে প্রতিহত করা, তারা আমাদের প্রতি আক্রমণ করার পূর্বেই তাদেরকে ভীতসন্ত্রস্ত করা বা আক্রমণ করার পর তাদেরকে বিতাড়িত করা। সুতরাং তাদেরকে প্রতিহত করা সম্ভব এমন সকল পদ্ধতি বা উপায়ই অবলম্বন করা বৈধ, চাই তা কোন শান্তিপূর্ণ যুদ্ধ হোক বা স্বশস্ত্র যুদ্ধ, এবং চাই তা প্রকাশ্য যুদ্ধ হোক বা স্নায়ু যুদ্ধ এবং চাই সে যুদ্ধটি একটি কর্তৃপক্ষ ও ঝান্ডার অধীনে হোক বা তা

ছাড়া হোক। কেননা শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ এর বক্তব্য অনুযায়ী এ ব্যাপারে ফুকাহায়ে কেরামের কিতাবে কোন শর্তারোপ করা হয়নি। বিশেষতঃ প্রতিরক্ষামূলক জিহাদের ক্ষেত্রে। বরং সামর্থ্যবান প্রতিটি ছোট-বড় ধনী-গরীব পুরুষ-মহিলার ওপর দায়িত্ব হল, তার সাধ্যমতো প্রতিরোধ করা, এমনকি পাথর দিয়ে হলেও। যেমনটি ফুকাহায়ে কেরাম বর্ণনা করেছেন।

যেমন হাশিয়ায়ে বাইজুরী আশ্ শাফিয়ী' কিতাবে প্রতিরক্ষামূলক জিহাদ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে,

"যদি কাফেররা মুসলমানদের কোন শহরে অনুপ্রবেশ করে বা শহরের কাছাকাছি কোথাও অবস্হান করে তাহলে তখন তাদের ওপর জিহাদ ফরজে আইন হয়ে যায়। সেক্ষেত্রে সে শহরবাসীদের জন্যে এমনকি তাদের মহিলা শিশু দাস ও ঋণগ্রস্তদের জন্যেও জরুরী হয়ে পড়ে তাদের সম্ভবপর হাতিয়ার দ্বারা কাফেরদের প্রতিহত করা, এমনকি পাথর দ্বারা হলেও, যদিওবা তাদের স্বামী অভিভাবক মনিব ও ঋণদাতাগণ তাদেরকে অনুমতি না দেয়।" (২/৪৯১)

তেমনিভাবে জিহাদের জন্যে যুদ্ধের প্রশিক্ষণ বা পর্যাপ্ত সক্ষমতা বা বিজয়ের সম্ভাবনা থাকাও শর্ত না।

যেমন খতিব আশ্ শিরবিনী আশ্ শাফিয়ী' রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

"কাফেরদের দ্বিতীয় অবস্থা হল এই যে, তারা আমাদের কোন শহরে প্রবেশ করে ফেলবে। সেক্ষেত্রে শহরবাসীর ওপর আবশ্যক হল, তাদেরকে যথাসাধ্য প্রতিহত করা এবং জিহাদ তখন ফরজে আইন হয়ে যায়, চাই যুদ্ধের জন্যে তাদের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা সম্ভাবপর হোক বা না হোক। আর যারা কাফেরদের অনুপ্রবেশকৃত শহর থেকে সফরসীমার মধ্যে অবস্থান করবে শহরবাসীর মাঝে লড়াইয়ের সক্ষমতা থাকো সত্বেও তাদের বিধানও হবে শহরবাসীর বিধানের ন্যায়। কেননা কাছাকাছি থাকার কারণে তারা যেন তাদের সাথে একই শহরে বসবাস করছে। তাই উল্লিখিত সকলেরই ওপর এমনকি তাদের গরীব শিশু ঋণগ্রস্ত ও দাসদের ওপরও অনুমতি

গ্রহণ ছাড়াই জিহাদ করা ওয়াজিব হয়ে যাবে। আর যারা সফরসীমার বাইরে থাকে তাদের জন্যে আবশ্যক হল, প্রয়োজনের সময় সামর্থ্য অনুযায়ী তাদেরকে রক্ষার জন্য তাদের নিকট গমন করা। সুতরাং নিকটবর্তীদের জন্যে তা ফরজে আইন হয়ে গেল এবং দূরবর্তীদের জন্যে হয়ে গেল ফরজে কেফায়া।" (আল ইকনা': ২/৫১০)

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

"প্রতিরক্ষামূলক জিহাদের রূপ এমন যে, যেন কোন স্হানে শত্রুরা এই পরিমাণ বেশী থাকবে যে, তাদের সাথে লড়াই করার মত সামর্থ্য মুসলমানদের নেই, কিন্তু তারা এই আশঙ্কাবোধ করবে যে, তারা শত্রুদের সাথে লড়াই করা থেকে বিরত থেকে চলে গেলে তাদের পিছনে রয়ে যাওয়া মুসলমানদেরকে শত্রুরা কাবু করে ফেলবে। সেক্ষেত্রে আমাদের ওলামায়ে কেরাম ঘোষনা করেছেন যে, তখন তাদের উচিত তারা নিজেদের ও যাদের নিয়ে তারা আশঙ্কাবোধ করছে সকলের জীবন বাজি রেখে শত্রুদের আত্নসমর্পন করার আগ পর্যন্ত লড়ে যাবে।

এর উদাহরণ হচ্ছে, শত্রুরা কোন মুসলিম শহরে আক্রমণ করা এবং মুসলমানদের যোদ্ধারা তাদের অর্ধেকেরও চেয়ে কম থাকা এবং তখন অবস্থা এমন হওয়া যে, যদি তারা লড়াই করা থেকে বিরত থাকে তাহলে শত্রুরা পবিত্র ভূমিকে জবরদখল করে নিবে তাহলে এই সুরত ও এর অনুরুপ সুরতগুলোতে যুদ্ধটি হবে প্রতিরক্ষামূলক আক্রমণাত্মক নয়, সেক্ষেত্রে বিরত থাকা কোন ক্রমেই জায়েয নেই।" (আল ফাতাওয়াল মিসরিয়্যাহ: ৪/৫০৯)

এ সবগুলো বিষয়েই উম্মতের ওলামায়ে কেরাম ও ইমামগণ একমত পোষণ করেছেন। তাই প্রতিরক্ষামূলক জিহাদে মুসলমানদের শক্তির প্রতি এবং তাদের সক্ষমতার প্রতি এবং তাদের বিজয়ের সম্ভাবনা বেশী থাকা না থাকার প্রতিও কোনরূপ ভ্রুক্ষেপ করা যাবে না। বরং মুসলিম ভূমির প্রতিরক্ষায় নিজেদের মৃত্যু নিশ্চিত জানা থাকা সত্বেও শরীরে রক্তের শেষ বিন্দু অবশিষ্ট থাকা পর্যন্ত আমরণ লড়ে যেতে হবে।

যেমন ইমাম শাফিয়ী রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

“আমি পুরুষদের জন্যে কোন দলের ওপর বর্মবিহীনভাবে আক্রমণ করতে বা সে মারা যাবে এই আশঙ্কা থাকা সত্বেও কোথাও আকস্মিকভাবে হামলা করতে কষ্টসাধ্য মনে করি না।” (আল উম: ৪/১৭৮)

এটা হচ্ছে আক্রমণাত্মক জিহাদের ক্ষেত্রে, সুতরাং প্রতিরক্ষামূলক জিহাদের ক্ষেত্রে তা আরে ভালভাবে প্রয়োগ হওয়ার দাবি রাখে। এবং প্রতিরক্ষামূলক জিহাদ শুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্ত নয় যে, তা আল্লাহর দ্বীনকে বুলন্দ করার জন্যে সম্পাদন করতে হবে। তবে হ্যাঁ, জিহাদের সর্বোত্তম ও সর্বোৎকৃষ্ট প্রকার ওটাই যা এ হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে,

من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله

অর্থাৎ: যে ব্যক্তি এজন্যে লড়াই করে যেন আল্লাহর দ্বীন বুলন্দ হয়ে যায়, সে আল্লাহর রাস্তায় রয়েছে।

হাদিসটি আক্রমণাত্মক জিহাদের বিষয়টি স্পষ্ট করে, এবং হাদিসের মর্মার্থ প্রতিরক্ষামূলক জিহাদের বিরোধী নয় বরং যারা ইজ্জত-সম্মান সম্পদ ও প্রাণ রক্ষায় মারা যাবে তারাও শহীদ। সুতরাং প্রতিরক্ষামূলক জিহাদকে বিধিবদ্ধ করা হয়েছে একাকী বা দলবদ্ধভাবে ভূমি, ইজ্জত-আবরু ও জান-মাল প্রতিরক্ষার জন্য। তাও আবার বিভিন্ন শ্রেণীর মুসলমানদের সহায়তায় বা অমুসলিম যেমনঃ জিম্মিদেরকে সাথে করে নিয়ে তাদের সকলের আবাসভূমি রক্ষার স্বার্থে।

তেমনিভাবে কাফের শত্রুদের থেকে মুসলমানদের জানমাল ভূমি ও ইজ্জত-সম্মান রক্ষায় অমুসলিম জনগণ ও অন্যান্য রাষ্ট্রসমূহ থেকেও সাহায্য গ্রহণ করা যাবে। রাসুল সাল্লাআল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মদীনার ইয়াহুদীদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলেন শত্রুদের মদীনা আক্রমণ কালে মদীনা প্রতিরক্ষার জন্যে। যেমনিভাবে ইরাক সিরিয়ায় সাহাবায়ে কেরামও সাহায্য গ্রহণ করেছিলেন আরব খৃষ্টানদের কাছ

থেকে তাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য। শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ তার সাথে বের হওয়া সিরিয়ানদের নিয়ে সিরিয়ায় তাতারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন, তাদের মাঝে তখনও বিভিন্ন প্রকার বেদআতী থাকা সত্ত্বেও এবং জিম্মিদের ইয়াহুদী খৃষ্টান বন্দিদেরকে তাতারীদের হাত থেকে মুক্তি দান করেছেন তাদের সাথে আলাপ আলোচনা করার পর তারা যখন মুসলমানদের সাথে জিম্মিদেরকেও মুক্তি করা ব্যতিত শুধুমাত্র মুসলমানদের মুক্তি দিতে রাজি না হয়।

মোটকথা প্রতিরক্ষামূলক জিহাদ শুদ্ধ হওয়ার জন্য কোন কিছুই শর্ত নয়। খলিফা বিদ্যমান থাকাও শর্ত নয়, ঝান্ডা বিদ্যমান থাকাও শর্ত নয়, আল্লাহর দ্বীন বুলন্দ করার ইচ্ছা করাও শর্ত নয়, কোন আলেমের ফতোয়াও শর্ত নয়, কাতার এক হওয়াও শর্ত নয়, শক্তি থাকাও শর্ত নয়, বিজয়ের সম্ভাবনা থাকাও শর্ত নয়। তবে তা মুজাহিদীনদের জন্য এক কাতারে এক আমীরের অধীনে থেকে জিহাদ করা ওয়াজিব হওয়ার বিরোধী নয়; কিন্তু যদি তা অসম্ভব হয় তাহলে জিহাদকে পরিত্যাগ করে বন্ধ করে রাখা হবে না।

والله تعالى أعلم وأحكم

—

লেখক পরিচিতি –

শাইখ ড. হাকিম আল মুতাইরি হাফিজাহুল্লাহ ৭/১১/১৯৬৪ সালে কুয়েতে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি জামিয়াতুল কুয়েতের "শরিয়াহ ও ইসলামিক স্টাডিজ" থেকে ১৯৮৯ সালে মাস্টার্স করেন। ১৯৯৫ সালে মক্কা মুকাররমার উম্মুল কুরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে "আল-ইখতিলাফ আলার-রাবি ওয়া আসরুহু আলার-রিওয়াইয়াত ওয়াররুয়াত" এর উপর "শরিয়াহ ও উসুলুদ-দ্বীন" অনুষদ থেকে মাস্টার্স করেন। ২০০০ সালে যুক্তরাজ্যের বারমিংহাম বিশ্ববিদ্যালয় এর "ইসলামিক স্টাডিজ" থেকে (ডক্টর অফ ফিলোসফি) পিএইচডি করেন।

ডক্টরেটের বিষয়বস্তু ছিল- "তাহকিক কিতাব ইহকামুজ জারিয়াহ ইলা আহকামিশ শরিয়াহ লিসসারমারি আল হানবালি মাআ দিরাসাতি শুবুহাতিল মুস্তারশিকিন হাওলাস সুন্নাহ আন নাবাবিয়্যাহ ও মুনাকাশাতিহা"।

তিনি ২০০৬ সালে মরক্কোর ফেজ এর জামিয়াতুল কারভিন থেকে "ফিকাহ" অনুষদ থেকে পিএইচডি করেন। বিষয় ছিল- তাহকিক কিতাব মুখতাসারুন নিহায়াহ ওয়াত-তামাম লিমুহাম্মাদ ইবনু হারুন আলকিনানি"।

তিনি কুয়েত বিশ্ববিদ্যালয়ের শরিয়াহ অনুষদে হাদিস ও তাফসীরের উস্তাদ ছিলেন। এছাড়াও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রতিষ্ঠানের প্রধান ও সহকারী প্রধানের দায়িত্ব পালন সহ নানামুখী কর্মকাণ্ড আঞ্জাম দিয়েছেন। তাঁর উস্তাদদের মধ্যে রয়েছেন- শাইখ মুহাম্মাদ বিন সুলাইমান বিন আব্দুল্লাহ আল-জাররাহ, শাইখ মুহাম্মাদ বিন সুলাইমান বিন আব্দুল্লাহ আল-আশকার, শাইখ আজিল আন-নাশমি, শাইখ আব্দুর রহমান বিন আব্দুল খালেক, শাইখ ইবরাহীম বিন সুলাইমান বিন আব্দুল্লাহ আল-জাররাহ, শাইখ ইউসুফ মুহাম্মাদ সাদেক, শাইখ আব্দুল আজিজ বিন বাজ, শাইখ আব্দুস সাত্তার ফাতহুল্লাহ প্রমুখ।

তিনি প্রথমে কুয়েতের হারাকাহ আস-সালাফিয়্যাহ এবং জেনারেল সেক্রেটারি ও পরবর্তী সময় হিজবুল উম্মাহ – এর জেনারেল সেক্রেটারির দায়িত্ব পালন করেছেন।

তাঁর লিখিত কিতাবের সংখ্যা ৩৪, এছাড়াও তিনি অসংখ্যা প্রবন্ধ ও গবেষনামূলক রচনা লিখেছেন।